রেকর্ড

বৌবাজার স্ট্রীট আর শেয়ালদার মোড়ের কয়েকটি ছোট ছোট গলি দিয়ে, কিংবা স্কট লেনের পাশ কাটিয়ে একটি বিচিত্র বাজারে ঢোকা যায়। ইংরাজিতে তার ভদ্র নাম 'সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট'—চল্‌তি বাংলায় 'চোরা বাজার'। একসময় বোধ হয় চোরাই জিনিসের বিক্রী-পাটা চলত এখানে—আজ সে পাট না থাকলেও অখ্যাতিটা আঁকড়ে বসেই আছে।

বৈঠকখানা মার্কেটের গাছপালার দোকানগুলি পার হলেই এই বাজারের সীমান্ত; এ অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নতুন পুরোনো প্রচুর সস্তার জুতো, শোলা হ্যাট, ইলেক্‌ট্রিক হীটার, তাপ্পি মারা স্টোভ আর লাল হয়ে যাওয়া দশ বারো আনা সেরের চিংড়ি মাছ। এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর বার্নিশের গন্ধ—তারপর আপনি একেবারে ফার্ণিচারের জগতে গিয়ে পৌঁছোবেন।

নতুন পুরোনো ফার্ণিচারে দোকানগুলো ঠাসা। ল্যাজারাস কোম্পানির আদি বার্মা টীক রং ফিরিয়ে অপেক্ষা করে আছে। আবার চকচকে নতুন জিনিস এক নম্বর সি-পি ভেবে কিনে এনে ছ'মাস পরে আবিষ্কার করবেন, কাঠটা বিশুদ্ধ জারুল। সস্তায় হয়তো খাঁটি মেহগিনীর জিনিস পাবেন, আবার প্রচুর পয়সা দিয়ে আলমারিটা এনে দেখলেন, ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্নিশ লাগিয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে।

অর্থাৎ রাস্তার লটারী। এক আনা দিয়ে কাঁটা ঘোরালেন—পেলেন তিনটি ছোট ছোট বিস্কুট; কিংবা কপালের জোর থাকল তো চন্দন সাবানই জুটে গেল একখানা।

তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারীর টিকিটই কিনতে হয়। বৌবাজার কিংবা রিপন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুক কেসের সন্ধানে। মনের মতো কিছু পেলুম না। ফিরে আসছি, এমন সময় একটা দোকানের দিকে নজর পড়ল।

ফার্ণিচারের দোকান নয়। 'বাবু কলকাতার' শেষ অভিজ্ঞান কতকগুলি গৃহসজ্জা। চীনে-মাটির বড় বড় 'পট', গিল্টিকরা ফ্রেমে বিলিতি ছবি, দু-একটা শ্বেতপাথর কিংবা ইমিটেশন স্টোনের ছোট বড় মূর্তি, ব্রোঞ্জের নগ্নিকা; পুরোনো

ফ্যাশানের আরো নানা টুকিটাকি। একটা চোঙাওলা গ্রামাফোনে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

হিন্দী গানের আকর্ষণে নয়। দেখলুম, স্তূপাকার পুরোনো রেকর্ড। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—এই মহাজন বাক্যে এখানে আমি লাভবান হয়েছি আগে। অর্থাৎ পুরোনো রেকর্ডের ভেতর থেকে পেয়েছি অপ্রাপ্য রবীন্দ্র-কণ্ঠ, পেয়েছি রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা'। তাদের কোনো-কোনোটা কোন মতে শ্রাব্য, আবার দু-একটা প্রায় নতুনের মতো। দাম আশাতীত সস্তা, বলাই বাহুল্য। বললুম, রেকর্ড দেখাও তো।

একজন বের করে দিল—অধিকাংশই সস্তা সিনেমার গান—কিংবা বাজার চলতি 'পপুলার ডিস্‌ক'—পুজোর অ্যাম্‌প্লিফায়ারে বাজাতে বাজাতে যারা অকালজরা লাভ করেছে। তবু এদের মধ্যেই একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা। ওপরের লেখাগুলোও রোমান হরফ বলে মনে হল না। দেখলুম বেশি পুরোনোও নয়।

হিন্দী রেকর্ডটা থেমে গিয়েছিল। বললুম, এটা বাজাও তো!

চোঙাওলা গ্রামোফোন থেকে প্রথমে একরাশ অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাজনা এর আগে কখনো শুনিনি। এক ড্রাম বাজছে—গীটারও আছে বোধ হয়, কিন্তু আরো কী কী যে আছে আমার বোধগম্য হল না। নানা ঢঙের বিদেশী ছবি দেখেছি—রেকর্ড শুনেছি অনেক, কিন্তু এ জিনিস কখনো কানে আসেনি এর আগে।

তারপর গান। নারী পুরুষের চার-পাঁচটি কণ্ঠ আছে মনে হল। যেমন অদ্ভুত বাজনা—তেমনি অদ্ভুত সুর। কেন জানি না—কোথায় রক্তের মধ্যে দোলা লেগে গেল। জানি এ সুর একেবারে অচেনা, তবু মনে হতে লাগল এ যেন আমি কবে কোথায় শুনেছিলুম। উলটো পিঠেও একই জিনিস—একটা গানকেই গাওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় পেলে এ রেকর্ড?

জবাব এল, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ওদের যে এজেন্ট আছে সে এনে দিয়েছে।

—এ কোন ভাষা?

বিহারী মুসলমান দোকানদার হেসে বললে, ক্যা মালুম?

বারো আনা পয়সা দিয়ে রেকর্ডখানা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। দর করলে হয়তো আরো সস্তায় হত, কিন্তু কেমন যেন মনে হল, দরাদরি করে খেলো করবার মতো গান এ নয়।

বাড়ি ফিরে মেশিনে দিয়েছি, আমার স্ত্রী করুণা উঠে এলো পড়ার টেবিল থেকে। নতুন অধ্যাপনায় ঢুকেছে—কলেজের ছাত্রীদের চাইতে পড়ার তাগিদ তার নিজেরই বেশি। ভুরু কুঁচকে বললে, এ আবার কী?

বললুম, দেখতেই পাচ্ছ, রেকর্ড বাজাচ্ছি।

—কী বিটকেল বাজানা রে বাপু! এ কাদের গান?

—জানি না।

—জানো না তো আনলে কেন?

—চুপ করো একটু, শুনতে দাও।

মিনিটখানেক ধৈর্য ধরে রইল করুণা। তারপর মুখের ওপর টেনে আনল রাজ্যের বিরক্তি।

—পাগল করে দিলে যে! কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও তুমিই জানো! পড়তে দেবার মতলব না থাকে তো বলো, সোজা ছাতে গিয়ে উঠি।

—লক্ষ্মীটি—আর একটুখানি। তিন মিনিটে তোমার জ্ঞানার্জনে কাঁটা পড়বে না। গান থামলে করুণার দিকে তাকালুম। দেখি হাতে একটা লাল-নীল পেনসিল নিয়ে এসেছিল, তার গোড়াটা চিবোচ্ছে আনমনার মতো।

—খুব খারাপ লাগল করুণা?

করুণা একটু চুপ করে রইল। বলল, না—খারাপ লাগল না। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াটা নষ্ট করে দিলে আমার।

—কেন?

—ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা! মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি!

বললুম, ঠিক তাই। আমারও অমনি মনে হয়েছিল।

করুণা আস্তে আস্তে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। মেশিনটা তুলে রেখে দেখি ও পড়ছে না, একটা ব্লটিং প্যাডের ওপর নীল পেনসিলের আঁচড় টানছে।

আমিও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম। কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না। দু'কান ভরে ওই বিচিত্র বাজনা আর গানের সুর বেজে চলেছে। কোথায় শুনেছি—কবে শুনেছি, কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। করুণা যেন আমারই ভাবনার সূত্র টেনে বললে, এ কী কাণ্ড করলে বলো তো?

—কী হল আবার?

—ওই রেকর্ডটা। ভারী অস্বস্তি লাগছে। যেন খুব চেনা—যেন—করুণা গুনগুন করে দু'তিনটে সুর ভাঁজল, তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, নাঃ—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আচ্ছা পাগলামি ধরিয়ে দিলে যা হোক! দিলে পড়াটা শেষ করে।

মোট কথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের দুজনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। এ একটা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা। খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এইমাত্র কোথাও রেখে তারপরে আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছটফটানি জেগে ওঠে, ঠিক সেই রকম।

রাত্রে খেতে বসে করুণা বললে, মনে পড়েছে।

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

—ছেলেবেলায় যখন আসামে ছিলুম, তখন খাসিয়াদের নাচের সঙ্গে যেন ওই রকম গান—

—খাসিয়াদের গান?

করুণা একটু বিভ্রান্ত হল যেন। তারপর মাথা নেড়ে বললে, না-না, ঠিক খাসিয়াদের নাচও নয়। ঠিক কী যেন—কী যেন—একটু চুপ করে থেকে বললে, বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ডাক শুনেছ কখনো? পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকে স্রোতের টানে কুটোর মতো ভাসিয়ে দেয়, দূরের বুনো হাতি গর্জে ওঠে, তখন নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—

বলতে বলতে হতাশ ভাবে চুপ করে গেল করুণা : কী জানি!

কিন্তু ঢাকের কথায় আর একটা স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। মানভূম—দুধারে কুসুম গাছের সারি আর ঘন বাঁশের বন—তারই ভেতর দিয়ে নির্জন পথ বেয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে—ঝালদার পাহাড় দূরে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশের একটা প্রকাণ্ড দীঘিতে পানডুবকীর কালধ্বনি, ঝিঁঝিঁর ডাক।

হঠাৎ পানডুবকী আর ঝিঁঝিঁর ডাক ছাপিয়ে গুরু গুরু করে উঠল নাগরার আওয়াজ। এদিক থেকে ওদিক, এ-দিগন্ত থেকে ও-দিগন্ত। কী একটা পরব আছে ওদের—গ্রামে গ্রামে শুরু হল ছৌ-নাচের পালা।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকার—কালো হয়ে আসা কুসুমগাছ আর বাঁশবন, ঝালদার পাহাড়ের ভুতুড়ে ছবি আর ওই নাগরার আওয়াজে হৃৎপিণ্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল, পুলিশের বুলেটের সঙ্গে লড়বার আগের দিন রাত্রে বিয়াল্লিশের আগস্টে, বালুরঘাটের অন্ধকার সাঁওতালি গ্রামগুলো থেকে অমনি ভাবেই নাগরা-টিকারার বোল আমি শুনেছিলুম।

বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক নাগরা-টিকারার আওয়াজ, ছৌ-নাচের বাজনা,—এদের সঙ্গে কোথায় এই রেকর্ডটার মিল আছে? মিলছে না—অথচ কোথায় যেন মিলছে। কিছুতেই মনে আনতে পারছি না—অথচ ঠিক মনে আছে। কী যে খারাপ লাগতে লাগল!

একটা অচেনা অজানা পুরোনো রেকর্ড কিনে আচ্ছা জ্বালা হল তো!

এর মধ্যে একদিন করুণার এক সহপাঠিনী এসে হাজির।

শহরের ওপরতলার বাসিন্দা—নিতান্তই একদা করুণার সঙ্গে গভীর সখীত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজনপাড়ায় পা দিয়েছেন। মহিলাটি বিদুষী এবং গুণবতী। ওয়েস্টার্ন মিউজিক শেখবার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। বরমাল্য দিয়েছেন এক মারাঠী একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে।

করুণা দারুণ খুশি হয়ে বললে, আইভি এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের এই পাজলটার একটা সলিউশন খুঁজে দে।

রেকর্ডখানা দেখে কপাল কোঁচকালেন আইভি।

—কোনো শ্লাভ্ ভাষা মনে হচ্ছে! বাজা তো!

বাজানো হল। আইভিও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শপ্যাঁ-ভাগনার-বাখ-বীঠোফোনের সঙ্গে পরিচয় আছে—তার ওপরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন আমাদের। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

শেষে ব্যাগ খুলে একটা টফি খেলেন। তার সেলোফোনের মোড়কটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, কোনো কমিউনিটি সং বলে মনে হচ্ছে। করুণা বললে, সে তো বোঝাই যায়। অনেকে মিলেই গাইছে যখন।

টফির মোড়কটাকে একটা আংটির মতো জড়ালেন আইভি। বললেন, নাউ আই রিমেমবার। সুইৎসারল্যান্ডের একটা ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলাম।

ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল! করুণা আমার দিকে তাকালো একবার। চোখে চোখ মিলল। উত্তরটা কারোই মনঃপুত হয়নি।

করুণা বলতে যাচ্ছিল : ঠিক বিয়ের সুরের মতো মনে হচ্ছে কী? তা ছাড়া সুইস্‌রা তো শ্লাভ্ বলে—

আইভি আর সময় দিলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ চলি ভাই। নিউ এম্পায়ারে একটা শো আছে, তার রিহার্সাল করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি—ন্যান্সি ইজ্ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি! এ পুয়োর লিটল থিং শী ইজ!

ন্যান্সি ওঁর দুহিতা নয়—কুকুর।

ওঁর মোটরটা চলে যেতে করুণা বললে, চালিয়াৎ!

আমি হাসলুম—জবাব দিলুম না! করুণা গজগজ করতে লাগল : ইউরোপে গাছের তলায় তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রী হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঙ্ক দিলে—

করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। আসল কথা, শ্রীযুক্তা আইভিও আমাদের নিরাশ করলেন। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।

সেদিন মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙল।

জল খেতে উঠেছি—কানে এল বাঘের ডাক। রাত দেড়টায় ঘুমন্ত কলকাতার ওপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গম্ভীর ধ্বনি বয়ে যেতে লাগল। আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ। মুখের কাছে জলের গ্লাসটা তুলে আমি নামিয়ে ফেললুম।

বাঘ ডাকছে।

আমাদের বাড়ি থেকে একটা সরল রেখা টানলে দুটো বড় রাস্তার ওপারে সোজা সার্কাস স্কোয়ার। একটা সার্কাসের দল দিন কয়েক হল তাঁবু ফেলেছে সেখানে। সেখান থেকেই আসছে বাঘের ডাক।

কল্‌কাতার এই অনিদ্রা আলো-জ্বালা-রাত্রে বাঘটা হয়তো সুন্দরবনের স্বপ্ন দেখছে। তাই চমকে জেগে উঠেছে—অসহায় ক্ষোভ আর নিরুপায় কাতরতায় ডেকে উঠছে ও-ভাবে।

কিন্তু কেন জানি না—আমার ওই বিদেশী রেকর্ডটাকে মনে পড়ল। মিল আছে—ওর সঙ্গেও মিল আছে। অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না—কিছুতেই না।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনে কয়েকটা পাম গাছ—তাদের মাথার ওপরে রাত্রির তারা—কয়েক টুকরো মেঘ, সব যেন বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বার বার।

শেষপর্যন্ত সমাধান করলেন এক ভূপর্যটক।

রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলেন?

—চোরা বাজারে।

—আশ্চর্য!

—কেন?

—এ কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি। এ রেকর্ড গোপনে তৈরি হয়েছিল—গোপনে বিক্রি আর বিলি হয়েছিল সামান্য সংখ্যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসীদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার। জ্বলজ্বল করে উঠল করুণার চোখ।—খুলে বলুন!

ইয়োরোপের একটা ছোট দেশের নাম করলেন পর্যটক। নাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তি-যোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল এর প্রতিটি কপি, এর অরিজিনাল—এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ সেই রেডর্ক পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে! পর্যটক থামলেন।

রাস্তা দিয়ে গর্জিত একটা ছাত্র-শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। আমরা তিনজনেই কান পেতে শুনলুম কিছুক্ষণ। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

পর্যটক আবার বললেন, একটা অত্যন্ত দামী জিনিস পেয়েছেন আপনি। জানি না, যুদ্ধের পর ওরা এই রেকর্ডটাকে আবার চালু করতে পেরেছে কিনা। যদি না পেরে থাকে—

ছাত্র-শোভাযাত্রার দূর-ধ্বনিটা হঠাৎ বন্যার মতো প্রবল বেগে ভেঙে পড়ল।

দুম দুম করে আওয়াজ উঠল কয়েকটা, তারপর পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে কে বলে গেল : লাঠি চলছে—টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে—

আবার স্তব্ধতা নামল ঘরে।

দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা—ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না—এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকি নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা-মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা—বালুরঘাটের রাত্রি-কাঁপানো টিকারার আওয়াজ—সার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর—আর আজকের এই ঘা-খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ-সুর এক। জানতুম, আমরাও এ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।

করুণা আমার দিকে তাকালো। দু'চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর। আস্তে আস্তে বললে, এ রেকর্ডকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।